সঞ্জয় ভট্টাচার্য : একটি সাক্ষাৎকার

আলাপচারিতায় : অমরেন্দ্র চক্রবর্তী, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবীর রায়চৌধুরী

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী : আপনি এখন কী লিখছেন?

সঞ্জয় ভট্টাচার্য : জীবনানন্দ সম্পর্কে লিখছি। জীবনানন্দের কবিতা নিয়ে দশটা প্রবন্ধ লিখবো, কবিতার পঙ্‌ক্তি ধ'রে ধ'রে আলোচনা। অনেক কবিতায় দেখছি—একই পঙ্‌ক্তি থেকে ভিন্ন-ভিন্ন অর্থ উঠে আসছে, আমি সেভাবেই লিখছি, ঠিক 'কবিতা-পরিচয়'-এর মতো নয়।

অ. চ : জীবনানন্দ নতুন ক'রে পড়তে গিয়ে আপনার কীরকম ধারণা তৈরি হচ্ছে? আগে যা ছিল তার চেয়ে অন্যরকম কিছু?

স. ভ : আমার ধারণা ডেভেলপ করছে। আমি সে-সময় বলেছিলাম জীবনানন্দ আমাদের যুগের কবি। আমার সে-ধারণা এখনো ঠিকই আছে। এখন, আমার মনেই ডেভেলপ করছে ওঁর কবিতা, না ওঁর কবিতাতেই সেই ডেভেলপমেন্টের বীজ আছে, সেটা আমি ঠিক বলতে পারি না। এখনো যখন আমি 'বনলতা সেন' পড়ছি, অন্য মানে পাচ্ছি—আগে যা ব্যাখ্যা করেছিলাম তা থেকে ভিন্ন।

অ. চ : আপনি বললেন, 'জীবনানন্দ আমাদের যুগের কবি,' জীবনানন্দের সমসাময়িক আর-কোনো কবি সম্পর্কে একথা আপনার মনে হয় না?

স. ভ : না। জীবনানন্দ আমাদের মনে, বিশেষ করে আমার মনে, যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন, আর কোনো কবি তেমন নয়। তাঁদের কবিতা আমার মনে হয়েছে বানানো কবিতা।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : 'আমাদের যুগ' বলতে আপনি কী বোঝাচ্ছেন?

স. ভ : চারের দশক পর্যন্ত, তিন আর চারের দশক—এই সময়টা। চারের দশকে অরুণ মিত্র একবার ঘোষণাই করেছিলেন, জীবনানন্দ আমাদের কবি। এর মধ্যে অনেক কবিই জীবনানন্দের দ্বারা খুবই প্রভাবিত হয়েছেন — যাঁরা কমিউনিস্ট-দলে যান নি তাঁদের অনেকেই, বা যাঁরা কিছু কিছু কিছু অন্য-ধরনের কবিতা লিখতে চেষ্টা করেছেন। তাছাড়া সব-চেয়ে বড় হচ্ছে ভাষা। একবার প্রেমেন্দ্র মিত্র আমাকে বলেছিলেন, 'জীবনানন্দ যে-ভাষায় লিখছেন সেই ভাষাটা হাওয়ায় ছিল, এটা হয়তো আমরা সবাই লিখতে পারতাম কিন্তু প্রথম লিখলেন জীবনানন্দ।' প্রেমেন্দ্র মিত্রও পারেননি, অন্য কেউই পারেননি। আমাদের যে-ভাষায় কথা বলা উচিত ছিল, সে-ভাষা আমরা বলতে পারিনি। প্রথম পেরেছেন জীবনানন্দ।

অ. চ : এই দিক থেকে আপনার নিজের কবিতা সম্পর্কে আপনার কী মনে হয়?

স. ভ : তুমি যদি কবিতা লিখে থাকো, তুমি জানো, সবাই স্বতন্ত্র হতে চায়।

অ. চ : প্রবন্ধ ছাড়া, যাকে বলে ক্রিয়েটিভ লেখা, সেরকম কিছু লেখার কথা এখন ভাবছেন না?

স. ভ : সেরকম আমি খুব সম্প্রতি একটা লিখে দিয়েছি একটা কাগজে—ছোট মতন উপন্যাস; এটা বড় হতো, তবে ওঁদের অনুরোধে আমি এটাকে শেষ ক'রে দিয়েছি।

অ. চ : আপনার নিজের অতৃপ্তি বোধ হয়নি যে অন্যের তাগিদে লেখা ছোট করতে হলো?

স. ভ : কী করবো, আমার টাকার দরকার ছিল। লেখাটা আমি আবার বাড়াবো, লেখাটার নাম বারান্দা, এ-নামই পালটে যাবে।

অ. চ : কবিতায় আপনি কি খুব বেশি অদল-বদল করার পক্ষপাতী?

স. ভ : না।

অ. চ : 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত আপনার 'বৌ' কবিতাটি 'উর্বর উর্বশী' বইয়ের অন্তর্ভূত করার সময় তো কবিতাটিতে অনেক বদল ঘটিয়েছিলেন, এমনকি নাম পর্যন্ত?

স. ভ : অন্যায় হয়েছে।

মা. ব : তাহলে কি 'কবিতা'য় যেটা ছিল সেটাই আপনার বেশি পছন্দ?

স. ভ : হ্যাঁ, 'কবিতা'য় যেটা ছিল, সেটাই ভালো ছিল।

সুবীর রায়চৌধুরী : কেন আপনি কবিতায় পরিমার্জনার পক্ষপাতী নন?

স. ভ : কারণ পরে যে-বদলটা হচ্ছে সেটা রীজ্ন্-এ হচ্ছে—কবিতা রীজ্ন্-এর ওপর নির্ভরশীল নয়।

অ. চ : কবিতার সবটাই রীজ্ন্-এর ওপর নির্ভরশীল নয়—এই কি আপনার বক্তব্য?

স. ভ : সবটা কেন, কোনোটাই নয়। এই শতকে, এই ইনডিটারমিনিজ্‌ম্-এর যুগে কার্যকারণ, রীজ্ন্—এই সবের কি কোনো মূল্য আছে? সায়েন্টিফিক ওয়ার্ল্ড তো প্রায় মিস্টিক ওয়ার্ল্ডে চ'লে যাচ্ছে। এলিঅটের 'ওয়েস্ট ল্যান্ড'-এ আছে না যে, 'কোনো ক্রপ্ বুনেছিলে কি, যার ফসল হলো?' সেইরকমই যেন মানুষের বীজ থেকে একটা গাছ হয়ে যেতে পারে। এও একটা সম্ভাব্য ব্যাপার। যাই হোক, কবিরা এতে মজা পায়। হয়তো কবিদের সবাই পাগল—যাকে বলে উৎকেন্দ্রিক। তাহলে আইনস্টাইনও উৎকেন্দ্রিক, ম্যাক্স প্লাঙ্কও তা-ই, জেমস জীন্‌সও—তাঁরা সবাই।

অ. চ : 'প্রবেশ-প্রস্থান' কবে বেরিয়েছিল?

স. ভ : বছর দুয়েক হলো। 'প্রবেশ-প্রস্থান' আমার শেষ সত্যিকারের উপন্যাস। ওটা আমি কারো অনুরোধে লিখিনি, নিজের জন্য লিখেছিলাম। বেশ বড় লেখা। তারপর যেগুলো লিখেছি সেগুলো টাকার জন্য লিখেছি—গল্পকে একটু বড়-করা। 'খবর' নামে একটা উপন্যাস লিখেছিলুম, গল্প বড়-করা, গল্পও হতে পারতো। তারপর আর-একটা লিখেছি 'যদিও সন্ধ্যা,' ওটাও গল্প হতে পারতো। এগুলো পত্রিকার জন্য লেখা। ওঁরা চেয়েছিলেন, আমারও টাকার দরকার, তাই লিখে দিয়েছি। 'বারান্দা' আমি নিজে থেকেই লিখছিলাম, কিন্তু আমারও টাকার দরকার, ওঁরাও চাইলেন, তাই আর ওটাতে কিছু ক'রে ওঠা গেল না। এগুলো ঠিক উপন্যাস নয়, এগুলো আমার দেরাজের মধ্যে প'ড়ে আছে, বই-আকারেও ছাপিনি।

অ. চ : গল্পকে বাড়িয়ে যখন উপন্যাস করেন, তখন সেই বাড়তি অংশগুলো কীভাবে আসে?

স. ভ : মূল গল্পটার যে বক্তব্য ছিল, সেটা থাকে; কিছু কিছু পার্শ্বচরিত্র আনা হয়—গল্পটাকে একটু কালারফুল করার জন্যে। পার্শ্বচরিত্রগুলো হয়তো একেবারে অবান্তর হয় না, মূল চরিত্রগুলোর সঙ্গে তাদের যুক্ত ক'রে লেখাটা কিছু-কিছু বাড়িয়ে দেওয়া হয়। গল্প সরল রেখায় চ'লে যায় আর উপন্যাস একটু ছড়িয়ে বসতে চায়, তাতে ছোটগল্পের মতো অতোটা গতি থাকে না। গতি কমাবার জন্যে চরিত্র কিছু বেশি আনতে হয়। গল্পে একটা সিচুয়েশন হয়তো একটা অনুচ্ছেদে ব'লে গেলাম, উপন্যাসে তাই

নিয়ে একটা পরিচ্ছেদ হয়ে গেল। বাড়াতে গেলে এইরকম হয়। এ আমার খুবই খারাপ লাগে। তবে নেহাৎ আমার দরকার হয়ে পড়েছিলো—

মা. ব : উপন্যাসে কি গল্পের অংশটা প্রধান ব'লে আপনার মনে হয়?

স. ভ : আমার উপন্যাস সম্পর্কে মোটের ওপর এই বলতে পারি যে, আমি কোনোদিন গল্প ভেবে উপন্যাস লিখিনি। আমার চরিত্র ভেবে উপন্যাস লিখি।

মা. ব : একটা বিশেষ সময়ের মধ্যে কতকগুলো চরিত্র—এই রকম?

স. ভ : বিশেষ ক'রে একটা চরিত্র। আমি 'সৃষ্টি'তে চরিত্রের চেয়ে বড় কিছু ধরেছিলাম—একটা মানুষ। একটা মানুষকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা—কতভাবে দেখা যায়

অ. চ : আপনার উপন্যাস বা বিশেষ কোনো উপন্যাস অন্তত পরোক্ষভাবেও কি আত্মজীবনীমূলক?

স. ভ : হ্যাঁ। আমার আত্মজীবনী খানিকটা আছে 'মৌচাক'-এ, খানিকটা আছে 'সৃষ্টি'তে, আর খুব বেশি আছে 'প্রবেশ-প্রস্থান'-এ। তবে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের একটা অসুবিধা আছে। একজনের জীবন নিয়ে লেখা অথচ মৃত্যু ছাড়া তার শেষ হয় না। প্রবেশ-প্রস্থানে সেই কারণেই একজন উপনায়ক তৈরি করা হয়েছে। একটা পরিচ্ছেদ নায়ক ব'লে যাচ্ছে, একই সময়ে আবার তার বন্ধুও ব'লে যাচ্ছে। এ-লেখাটার টেকনিক 'সৃষ্টি'রই মতো, কিন্তু পুরোপুরি নয়।

অ. চ : এই যে বিশেষ একটা উপন্যাস লেখার সময় বিশেষ একটা টেকনিক আপনি গ্রহণ করেন, সেটা আপনার মাথায় কীভাবে আসে?

স. ভ : আমি উপন্যাস লিখবো ভাবিনি, কেননা আমার মনে হতো—উপন্যাস তো অনেকদিন ধ'রেই লেখা হচ্ছে, তাহলে আমি আর কেন লিখবো? তখন আমি এই একটা দেখলাম যে বাঙলা উপন্যাসে টেকনিক নিয়ে কাজ হয়নি। সেসব সরল রেখার ধরনে বা সময়ের পুরনো ধারণা থেকে লেখা : সময় একটা সরলরেখার মতো পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি ভাবলাম, আমি একটা প্রেমকাহিনী লিখবো বা আর-কিছু লিখবো, যা-ই লিখি, অন্তত টেকনিকটা নতুন করবো। উপন্যাসে আমি সময়ের নতুন ধারণা প্রয়োগ করলাম—সময় যেন একটা বৃত্তের মতো; উপন্যাসটার নামও 'বৃত্ত'। ফর্মটা তৈরি হয়েছে আমার বিষয়বস্তু থেকে, তা নয়; টেকনিক ভেবেছি, বিষয়বস্তু দিয়ে ভরতি করা হয়েছে। আমার দ্বিতীয় বা তৃতীয় উপন্যাসও এভাবে লেখা। তারপর যেগুলো লিখেছি, সেখানে বিষয়বস্তু টেকনিক তৈরি করেছে।

অ. চ : কিছুকাল পূর্বে আপনি যে-উপন্যাসটা শেষ করলেন, ওটা লিখতে গিয়েও কি আপনাকে টেকনিকের সমস্যা নিয়ে নতুন ক'রে ভাবতে হয়েছে?

স. ভ : এখানে সমস্যাটা টেকনিকের নয়। আমি ভেবেছিলাম ওখানে একটা নতুন ধরনের চেতনাপ্রবাহের প্রবর্তন করবো। আমার মনে হয়েছে, একটা মেয়ের চেতনার প্রবাহ যা, যেরকম হয়, একটা ছেলের তা হয় না; একটা শিক্ষিত লোকের যা হয়, একটা অশিক্ষিত লোকের তা হয় না। আমার এই ধারণা—ধারণা নয়, শিক্ষা—হয়েছে ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌ বা অন্যান্যদের লেখা প'ড়ে—একটা মেয়ে যখন নিঃসঙ্গ অবস্থায় ভাবছে, তখন তার কোনো বাক্যের পর যতি থাকে না। অথচ ব্যাপারটা সরলভাবেও চলে না, জটিল বহুমুখী রূপ তার। আবার তার থেকে কিছু কমিউনিকেটেড হয়ও বটে। অনেকটা এইভাবে ভাবতে চেষ্টা করেছিলাম, তবে লেখাটা তো মাঝপথেই থেমে গেল। লিখতে লিখতে হয়তো অন্যরকম হয়ে যেতো। সব সময়ে ঠিক ক'রে বলা যায় না, কবিতার মতোই।

অ. চ : লেখার সময় আগেকার বাঙলা সাহিত্যের অভিজ্ঞতা কীভাবে আপনি ব্যবহার করেন?

স. ভ : বাঙলা উপন্যাসের কথা আমি ভাবিনি। কোনো উপন্যাস লিখতে বাঙলা উপন্যাসের কথা ভাবি না। কবিতা লিখতেও বোধহয় আমার সামান্য যা বিদেশী কবিতা পড়া তার কথাই আমি ভাবি।

অ. চ : আপনি উপন্যাসে যে নানারকম টেকনিকের কথা ভেবেছেন, কবিতার ক্ষেত্রে সেরকম কিছু ভেবেছেন?

স. ভ : আমি যখন কবিতা লিখতে শুরু করি, তখন আমি জানতাম না, আমি কী কবিতা লিখছি। ৩০ সালে আমি বি এ পাশ করি, ৩২ সালে 'পূর্বাশা' বার হয়। তখন আমি ঠিক মতন কবিতা লিখতে শুরু করি—কাগজের জন্য। তখন কয়েকটি কবিতা ছাপা হয় সুধীন্দ্রনাথের 'পরিচয়' পত্রিকায়। ছাপা হয়, কিন্তু কী ধরনের কবিতা আমি লিখতাম সে-সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না। এই ধরনের কবিতা লিখবো কি অন্য ধরনের কবিতা লিখবো—তেমন ভাবনা আসেনি। তারপর সুধীনবাবুর মুখে আমার কবিতার প্রথম সমালোচনা শুনি। তিনি বলেছিলেন, 'আপনার লিরিকগুলো নৈর্ব্যক্তিক হয়।' কথাটা আমাকে অনেক ভাবিয়েছে, পরে আমি বুঝতে পেরেছি। আমার লিরিককে তিনি তখনকার দিনে উৎকৃষ্ট ব'লে মনে করতেন; যদিও বিন্দুমাত্র মেলে না আমার কবিতা তাঁর কবিতার সঙ্গে। যাই হোক, তাঁর কথা থেকেই আমি বুঝলাম, এগুলি লিরিক হচ্ছে এবং নৈর্ব্যক্তিক হচ্ছে। তখনো এই কবিতাগুলি বড় হতো না। বড়জোর চোদ্দ কি ষোল পঙক্তি। কিন্তু আমি লিরিক লিখবো, না অন্য কিছু লিখবো, আগে থেকে কখনো আমি তা ঠিক করিনি।

অ. চ : কবিতা লেখার প্রথম পর্বে নিজের মধ্যে আপনি কি অন্য কোনো কবির প্রভাব বোধ করেছিলেন?

স. ভ : না।

অ. চ. আপনি নতুন কিছু লেখারই চেষ্টা করতেন?

স. ভ : হ্যাঁ, চেষ্টা করতাম যাতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব না আসে। আর কারো কথা মনে হয়নি। বুদ্ধদেব তখন 'বন্দীর বন্দনা' ইত্যাদি লিখছেন। আমার ওসব ভালো লাগতো না। তাই আমার কবিতা হতো ভিন্ন ধরনের। একেবারেই ওঁদের মতো নয়।

অ. চ : আপনার মনে যে আবেগ আসে, আপনি কি তাকে সরাসরি কবিতায় ধরে দিতে চান, না কি তাকে বুদ্ধিগত স্তরে নির্বাচন বা পরিমার্জনা ক'রে নিয়ে রূপ দেন?

স. ভ : কবিতা লেখবার তো কোনো সময় নেই। কোনো সময় হয়তো টেন্সড্ হয়ে এলো আমার মনটা—হয়তো কবিতার একটা পঙক্তি এলো, একটা দুটো তিনটে কি চারটে পঙক্তি এলো, কোনোরকম চেষ্টা নেই কিছু নেই—আগে আসতো সমস্ত কবিতাটাই, আমি লিখে ফেলতাম—কেউ যেন ডিক্টেট ক'রে গেলো, আমি লিখে গেলাম।

মা. ব : অর্থাৎ রিলকে প্রভৃতি যাকে অটোমেটিক রাইটিং বলেন আপনি বোধহয় তার কথাই বলছেন?

স. ভ : ও-জিনিসটা বোধহয় এখন ঠাট্টার ব্যাপার হয়ে গেছে, রোমান্টিক কবিরা ছাড়া এখন অটোমেটিক রাইটিং কেউ লেখেন না। যাই হোক, কবিতার মধ্যে একটা রীজন্‌ও প্লে করে। হয় কি, আমি হয়তো চারটে পঙক্তি লিখলাম ওতে একটা কিছুই হয়তো দাঁড়ালো না, হয়তো একটা খসড়া হলো, তখন রীজন্ আসে। হয়তো ভাষার কথা ভাবতে হচ্ছে, একটা ওয়ার্ড-এর কথা ভাবতে হচ্ছে—কলমটা একটু থামলো, আর না হয় হয়ে গেলো তো হয়েই গেলো। আমি সচেতনভাবে সিম্বল বা ইমেজ তৈরি করার চেষ্টা করিনি, যদি ওসব এসে গেলো তো গেলো।

সু. রা. চৌ : আপনি বলছেন যে উপন্যাসের ব্যাপারে যেরকম সচেতনভাবে টেকনিক নিয়ে ভেবেছেন, কবিতায় সে-রকম করেন নি? কবিতা কি আপনার কাছে বেশি স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়?

স. ভ : কবিতা সম্বন্ধে আমি একসময় বলেছিলাম, যা আমি কোনো প্রবন্ধে লিখতে পারিনি বা উপন্যাসে বলিনি তা-ই কবিতায় বলেছি। এখনো এই কথা বলি।

মা. ব : কবিতা, না উপন্যাস, লেখক হিশেবে কাকে আপনি প্রাধান্য দেবেন? প্রকাশের মাধ্যম হিশেবে কোন পদ্ধতিকে আপনার বেশি অনিবার্য মনে হয়েছে?

স. ভ : এটা তো আমি ঠিক ভেবে দেখিনি।

অ. চ : কবিতা ও উপন্যাস লেখায় আপনার কি আনন্দের তারতম্য ঘটে?

স. ভ : দু-একটা কবিতার বেলা তা হয়েছে, লিখে আনন্দ পেয়েছি।

অ. চ : আপনার 'পৃথিবী' বেরিয়েছিল ১৩৪৬-এ। ১৩৫৪ সালে প্রকাশিত 'সংকলিতা'য় অন্যান্য কবিতার সঙ্গে 'পৃথিবী' ও 'সাগর' থেকেও কিছু কবিতা ছিল। 'সাগর' কোন সালে বেরিয়েছিল?

স. ভ : ১৯৩৭-এ। সেই আমার প্রথম কবিতার বই।

মা. ব : এরকম দাবি করা হয় যে 'কল্লোল' কবিতায় গল্পে উপন্যাসে নতুন সাড়া এনেছে, আপনি মানেন?

স. ভ : কল্লোলের লেখকেরা ইনডিভিজুয়াল, তাঁদের মধ্যে বোঝাবুঝি ছিল কিন্তু এটাকে কোনো মুভমেন্ট বলা যাবে না। তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে কল্লোল যুগের লেখকদের মধ্যে যৌনমুক্তির চেষ্টা ছিল। বিশেষ ক'রে যুবনাশ্বের গল্পে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যেও সেই চেতনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, মানিকের তাই যদি কোনো ঐতিহ্য থেকে থাকে তবে তা যুবনাশ্বের।

সু. রা. চৌ : 'পূর্বাশা' প্রকাশের পেছনে কোনো আন্দোলন-বোধ ছিল কি?

স. ভ : সেটা হয়েছিল চল্লিশে। প্রথম দিকে ছিল, নতুন লেখকদের জন্য।

সু. রা. চৌ : 'পূর্বাশা'য় আপনার রাজনৈতিক মত কাজ করতো কি?

স. ভ : সেটা হয়েছিল চল্লিশের পর। আমরা চেয়েছিলাম, দেশের মধ্যে একটা হার্ড থিঙ্কিং আসুক। আমরা বুঝেছিলাম, স্বাধীনতা আসবেই। স্বাধীনতার জন্য মানসিক প্রস্তুতির দরকার। সমাজ, অর্থনীতি, শিল্প-সাহিত্য—সব ক্ষেত্রে।

অ. চ : 'পূর্বাশা'র সেই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে বলে আপনার মনে হয়?

স. ভ : সর্বৈব বিফল। কেন যে এমন হলো জানি না। এটা ইনডিটারমিনিজম্-এর যুগ। আমরা কি চেয়েছিলাম এর পর অবধূতের সাহিত্য হোক?

মা. ব : হালের বাঙলা উপন্যাস আপনার কীরকম লাগে?

স. ভ : হালের উপন্যাস আমি পড়িনি। একজন একটা পড়তে বলেছিলো, সমরেশ বসুর 'প্রজাপতি'। 'বিবর' নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছিলো দেখে পড়তে শুরু করেছিলাম, পাতা আষ্টেক প'ড়ে ছেড়ে দিলাম, ভালো লাগলো না।

অ. চ : আপনি যে এতদিন লিখছেন, সাহিত্যের মাধ্যম হিশেবে বাঙলা ভাষাকে আপনার কখনো কি

অনুপযোগী মনে হয়েছে?

স. ভ : না। আমার এই মনে হয়েছে যে, ভাষাটাকে হয়তো আমি পুরোপুরি জানি না বুঝি না ব'লে, অনেক সময় আমি ব্যর্থ হয়েছি।

অ. চ : বাঙলা ক্রিয়াপদের শৈথিল্য নিয়ে আপনার কখনো অসুবিধে হয়নি?

স. ভ : যতোটা সম্ভব ক্রিয়াপদ এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। সম্ভব কিনা জানি না। ভাষা নিয়ে আমি অতো ভাবিনি। যা বলতে চাই, ভাষার প্যাটার্ন সেই অনুযায়ীই তো হবে। তবে ভাষা যতটা সম্ভব সহজ হলেই ভালো হয়—আমার অভিজ্ঞতা থেকে এই বুঝেছি, এখন কবিতায় যা বোধ করছি। কঠিন শব্দ, যা বিষ্ণু দে ব্যবহার করেন, আমি আনতে চাই না। শব্দগুলো যতোটা আমাদের কথ্যভাষার লাগোয়া হয়, ততোই ভালো। আমরা তো কথ্যভাষায় কঠিন শব্দ ব্যবহার করি না। রবীন্দ্রনাথ করতেন। ... আমি কি কথ্যভাষার মতো করতে চাইছি, না কী, বুঝতে পারছি না। আমি চাই সহজ ভাষা।

সু. রা. চৌ : আপনার উপন্যাসে যেমন প্রেম বা অন্য সব সম্পর্ক আসছে, সেই রকম রাজনীতি, ছাত্র-আন্দোলন বা সমাজ-চিন্তা কীভাবে আসছে?

স. ভ : আমি নানাসময় ওসব কথা উপন্যাসে বলেছি। কখনো সমসাময়িক যুগের প্রতিক্রিয়ায়, কখনো ধূর্জটি মুখোপাধ্যায় বা কারো সঙ্গে আলোচনার ফলে সোশ্যাল কনটেন্ট আমার উপন্যাসে এসেছে। চাষী, মজুর, এরা সব এসেছে। তবে ধূর্জটিদা যেমন বলেছিলেন, এদেশে এখনো বুর্জোয়া উপন্যাসই হলো না, তো কম্যুনিস্ট উপন্যাস। ধূর্জটিদার সেকথা মনে ছিলো, যখন আমি 'দিনান্ত' উপন্যাস লিখি। কবিতার ব্যাপারে কিন্তু ওরকম কিছু হয়নি।

অ. চ : অর্থাৎ উপন্যাস আপনি লেখেন বাইরের ঘটনার প্রতিক্রিয়া থেকে আর কবিতায় তাকে আপনি মূল্য দেন না। তাহলে কি উপন্যাসে আপনি সামাজিক জীব হিশেবে কর্তব্য করেছেন?

স. ভ : শেষের দিকের উপন্যাসে তা নয়। যেগুলোতে আত্মজীবনের ছোঁয়া লেগেছে সেগুলোতে ওরকম হয় কী ক'রে? সামাজিক পরিচয় বাদ দিয়ে আমি মানুষ অর্থাৎ জীবনের রহস্যময়তাকে ধরবার চেষ্টা করেছি; এই ভাবে দেখা আমার উপন্যাসে পরে এসেছে।

অ. চ : আপনি যে উপন্যাসে সোশ্যাল কনটেন্ট-এর কথা বললেন—সে-সময় ঐ প্রবণতা তো হাওয়ায় ছিলো—তার ফলে বাঙলা সাহিত্যে ভালো বা মন্দ কোনো ফল হয়েছে কি?

স. ভ : কী হিশেবে ভালো বা মন্দ? ওর কোনো ইমপ্যাক্ট হয়েছে ব'লে আমার তো মনে হয় না কার ওপর ইমপ্যাক্ট হবে? চাষী-মজুররা তো ওঁদের লেখা পড়ে না। আর ইনটেলেকচুয়ালরা ওঁদের উপন্যাস পড়ে, অনেকটা রহস্য-উপন্যাস পড়বার মতো। জিনিসটা তাঁদের জীবনের নয়। হয়তো পড়েনও না।

অ. চ : একজন লেখকের ক্ষেত্রে তাঁর স্বাভাবিক প্রতিভার সঙ্গে তাঁর পড়াশোনার কি কোনো অবিচ্ছেদ্য যোগ আছে?

স. ভ : আছে, নিশ্চয় আছে। প্রতিভা দিয়ে একটা সীমা পর্যন্ত যাওয়া যায়। এর একটা বড় উদাহরণ নজরুল।

অ. চ : আপনি তো একসময়ে নতুন সাহিত্যের সঙ্গে খুবই জড়িত ছিলেন। এখনকার নতুন-সাহিত্য, যা নাকি আপনাদের পরেও নতুন, সে বিষয়ে আপনার কী ধারণা? কোনো আস্থা তৈরি হয়েছে কি?

স. ভ : আস্থা-অনাস্থার কথা নয়। আমি খুবই খুশি হতাম, যদি এখনকার সাহিত্যে কোন কোন নতুন প্রবণতা এসেছে তার সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত হ'তে পারতাম এবং সেই প্রবণতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে লিখতে পারতাম। তবে কেউ-কেউ বলছেন, আমার কোনো-কোনো লেখা হয়তো এখনকারও। তা যদি হয়ে থাকে খুব বড়ো ব্যাপার হয়েছে। আমি তো ঘরের মধ্যেই থাকি; তবে হয়তো হাওয়া আসে, এর জন্য লিখতে পারি।

অ. চ : এমন কোনো ভাবনা বা অভিজ্ঞতা আপনার মনে কি তৈরি হচ্ছে, যাতে আপনি মনে করছেন একটা কোনো নতুন লেখায় আপনি হাত দেবেন?

স. ভ : এরকম কোনো ভাবনা বা চাপ আমি বোধ করছি না।

অ. চ : এখনকার লেখকদের লেখায় নতুন অভিজ্ঞতার কি কোনো পরিচয় পাচ্ছেন?

স. ভ : আমি এখনকার কবিতা পড়ি, পত্র-পত্রিকা মারফৎ যা পাই, গদ্য লেখা বাঙলায় বড় পড়ি না। কবিতা পড়ি আর বুঝতে চেষ্টা করি। প্রত্যেক মানুষই তো স্বতন্ত্র। এখনকার লেখকদের আর আমাদের যুগও তো আলাদা। এখনকার তরুণেরা যে-পরিবেশে যৌবনে এসে পৌঁচেছে, আমরা তো সে-পরিবেশ থেকে যৌবনে এসে পৌঁছোইনি। এখনকার একটি যুবকের মনকে আমার যৌবন দিয়ে আমি ধরতে পারছি না।

অ. চ : এখনকার বাঙলা কবিতায় যে জটিলতা এসেছে, সে কি সময়ের পরিবর্তনের ফলে যে মানসিক অভিজ্ঞতার পরিবর্তন ঘটে গেছে, তার জন্যে হয়েছে মনে করেন?

স. ভ : পঞ্চাশের কোনো-কোনো কবি খুব যন্ত্রণার কথা বলেন—যন্ত্রণা শব্দটাই তাঁরা বারবার ব্যবহার করেছেন,—যেন তাঁরা খুব সাফার করছেন, এই সাফারিংটা আমি কোনোদিন অনুভব করিনি। বাস্তব জীবনে আমি খুব সাফার করেছি। কিন্তু তা আমার কবিতায় আসেনি।

অ. চ : রবীন্দ্রনাথের পরে কোন কবিকে আপনার সবচেয়ে সম্পূর্ণ মনে হয়েছে?

স. ভ : জীবনানন্দ।

অ. চ : আর কোনো কবি?

স. ভ : না। আমি সুধীন্দ্রের কথা ভাববো না, বুদ্ধদেবের কথা ভাববো না, বিষ্ণু দে'র কথা ভাববো না, প্রেমেন্দ্রের কথা ভাববো না। কেবল জীবনানন্দই একটা সম্পূর্ণতা লাভ করেছিলেন।

অ. চ : এখনকার কবিদের মধ্যে কাকে আপনার ভালো লাগছে? ধরুন, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়—

স. ভ : এঁদের ওপর আমি একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম, সেটা কিছুই হয়নি। এঁদের সকলেরই কিছু-কিছু ভালো লাগে। কিছু-কিছু দুর্বোধ্যও মনে হয়।

অ. চ : দুর্বোধ্যতা কি তাঁদেরই অক্ষমতার জন্যে ব'লে আপনার মনে হয়?

স. ভ : সেটা আমি কী ক'রে বলবো? এখন, কেউ যদি র‍্যাবোর মতো শুধু ড্রিম-ইমেজ ব্যবহার ক'রে যান, কোনো কোনো ড্রিম আমার কাছে কমিউনিকেটেড হয়তো হলো না—এটা আমার ত্রুটি হতে পারে, কবিরও ত্রুটি হতে পারে। কবিতা যখন আমি সমালোচনা করবো, পাঁচবার সাতবার ভেবে একটা কিছু বলবো—এবং, হয়তো, কমিট করবো না কিছুই।

অ. চ : বাঙালি পাঠকদের কাছ থেকে আপনি কি সন্তোষজনক সাড়া পেয়েছেন ব'লে মনে করেন?

স. ভ : না। আমার একটা দুর্নাম আছে প্রথম থেকেই— আমি দুর্বোধ্য, আমি মোটেও প্রাঞ্জল নই, আমায় বোঝা যায় না। এটা হচ্ছে যারা আমার প্রতি, যাকে বলে আক্রমণাত্মক, তাদের কথা। আর যারা বন্ধু হয়ে আমাকে বিপন্ন করেছে, তারা বলেছে যে, ওসব ইনটেলেকচুয়াল লেখা। ফলে আমার একেবারে কোনো পাঠক নেই। এবং আমার সাহিত্য সম্বন্ধে আমার শেষ কথাটা আমি ব'লে নিই। আমার শেষ কথা এই : হয় আমি সাহিত্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, না-হয় বাঙলা দেশের পাঠক এবং সমালোচকেরা সাহিত্য বিষয়ে নেহাৎ নির্বোধ। এই সিদ্ধান্তে আমি উপনীত হয়েছি, আমার ষাট বছর বয়সে। আর এক ছত্রও লিখতে ইচ্ছে করে না আমার।

'সারস্বত' পত্রিকার পরের সংখ্যায় (১৯৬৮) এই সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে সঞ্জয় ভট্টাচার্য একটি চিঠি লিখেছিলেন:

সবিনয় নিবেদন,

'সাক্ষাৎকার' সম্পর্কে দুটি কথা...আমি বোধহয় 'চারের দশকে অশোক মিত্র' বলেছিলাম, 'অরুণ মিত্র' নয়। যদি ব'লে থাকি, ভুল করেছি। কবিতায় রীজন্-এর কথা অস্বীকার ক'রেও নিজের কবিতা-রচনার কালে আমি রীজন্-এর ভূমিকা এনেছি। সে-রীজন্ যে কবিতা-রচনা-কাল থেকেই উদ্গত, তা আমি বুঝিয়ে বলতে পারিনি। কারণ, সময়ের অভাব ছিলো। তবু তা ত্রুটি এবং তা অমার্জনীয়।

৮.৭.৬৮ ইতি

কোলকাতা - ৩১ সঞ্জয় ভট্টাচার্য

এই সাক্ষাৎকার 'সারস্বত' পত্রিকার (সম্পাদক: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী ও দিলীপকুমার গুপ্ত) দ্বিতীয় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫) থেকে পুনর্মুদ্রিত হলো।